১০

বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ
Global Environmental Issues

বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের ক্ষয়, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, প্রভৃতি কারণে বর্তমান বিশ্বে দুর্যোগ ও দুর্যোগঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার প্রবণতা ও প্রকটতা বিবেচনা করে পরিবেশ দূষণের ফলে পরিবেশ অবক্ষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়কে বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আলোচ্য ইউনিটে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ

পাঠ - ১০.২ : পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন

পাঠ - ১০.৩ : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি

পাঠ - ১০.৪ : ওজোন স্তরের ক্ষয়

পাঠ-১০.১ বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ
Global Environmental Issues

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানবিক কার্যাবলির কারণে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তা চিহ্নিত করে টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিকভাবে পরিবেশের জন্য সংকটপূর্ণ কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ নামে পরিচিত। বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজগুলো বিশ্ব পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। নিম্নে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ চিত্র ১০.১ এ দেখানো হয়েছে।

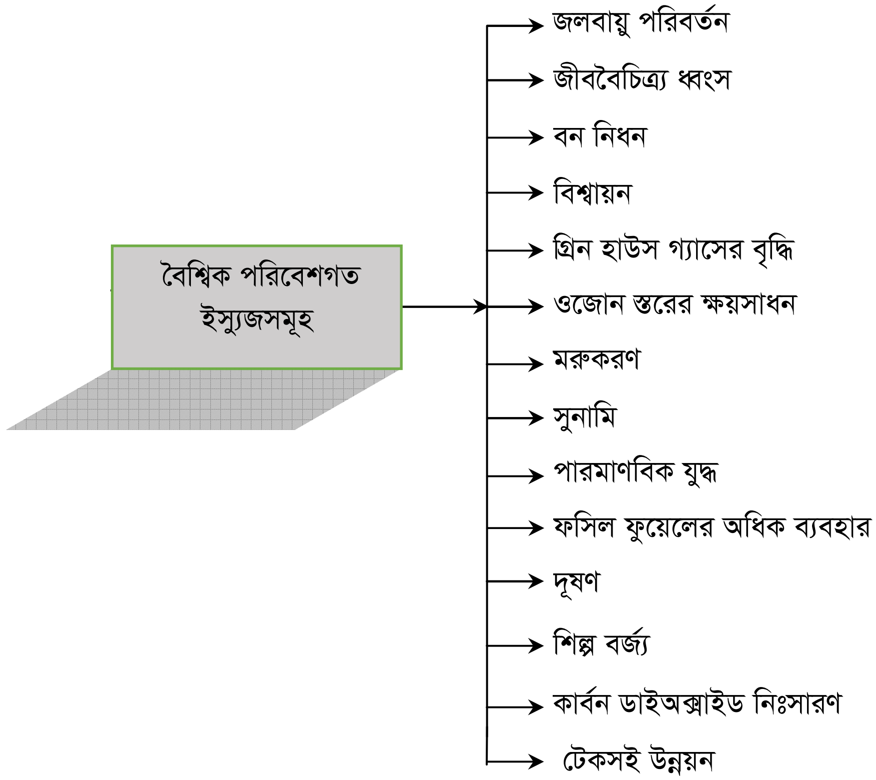

চিত্র ১০.১ পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ

১. **জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change):** জলবায়ু পরিবর্তন হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো এলাকার আবহাওয়ার পূর্ণ পরিবর্তন বা গড় পরিবর্তন। পরিবেশগত দূষণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়। যার ফলাফল হিসেবে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রভৃতি। জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশের প্রায় সবকিছুকে প্রভাবিত করে। যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবেশগত পরিবর্তন হয় ফলে বিশ্বের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস (Destruction of Biodiversity): জীববৈচিত্র্য ধ্বংস গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজ। দূষণের কারণে খাল-বিল, নদীনালা, জলাশয়, সমুদ্র প্রভৃতি প্রতিবেশ সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো বিশেষ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। যেমন- সিডর, আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বন নিধন (Deforestration): অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং বনায়নের কারণে বনজ সম্পদের চাহিদা বাড়ছে এবং বন নিধন চলছে। এতে করে মোট বনভূমি কমে যাচ্ছে। যে কোনো দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট এলাকার ২৫ শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন।

বিশ্বায়ন (Globalization): আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কলকারখানা বাড়ছে, ফলে শিল্প বর্জ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পরিবেশগত দূষণ বাড়ছে। বিশ্বায়ন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলেও বিশ্বায়ন পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে । তাই বর্তমান বিশ্বে, বিশ্বায়নও গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজ।

গ্রিন হাউস গ্যাস (Greenhouse Gas): গ্রীন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে এ কারণে বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজে গ্রীন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধি বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়। পরবর্তী অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজ হিসেবে গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধন (Depletion of Ozone layer): ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধনের জন্য সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি জীবমণ্ডলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি করছে। পরবর্তী ইউনিটে ওজোন স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

সুনামি (Tsunami): সুনামি (Tsunami) জাপানি শব্দ, অর্থ পোতাশ্রয়ের ঢেউ। সমুদ্র তলদেশে প্রবল ভূমিকম্প সৃষ্টি হলে সমুদ্র পৃষ্ঠে যে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাকে সুনামি বলে। সুনামির প্রতিটি ঢেউ ঘন্টায় ৬৪০-৯৬০ কি.মি. বেগে প্রবাহিত হয়। উপকূলের নিকটে সুনামির ঢেউয়ের গতির প্রচণ্ডতা কমলেও ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়ে যায় বহুগুণে। বর্তমানে সুনামি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজ।

মরুকরণ (Deforestation): বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মরুকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে, সাব-সাহারান, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে মরুকরণ দেখা যাচ্ছে ।

পারমাণবিক যুদ্ধ (Nuclear War): ১৯৪৫ সালের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং দূরবর্তী অঞ্চলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার দরুন রেডিওঅ্যাক্টিভ দূষণকে বৈশ্বিক হুমকি হিসেবে দেখা হয়।

শিল্পবর্জ্য ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসারণ (Industrial Waste and Emission of Carbon di Oxide): পানি, মাটি ও বায়ুকে বিভিন্নভাবে শিল্পবর্জ্য দূষিত করছে। এছাড়াও কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্যাসের বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করে জলবায়ুগত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে।

টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development): পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এর অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন । তাই টেকসই উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজ।

সারসংক্ষেপ:

মানবিক কার্যাবলির কারণে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তা চিহ্নিত করে টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিকভাবে পরিবেশের জন্য সংকটপূর্ণ কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজ নামে পরিচিত। বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজগুলো বিশ্ব পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ হলো- জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, বন নিধন, বিশ্বায়ন, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ, ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধন, সুনামি, মরুকরণ, পারমাণবিক যুদ্ধ, শিল্পবর্জ্য ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসারণ এবং টেকসই উন্নয়ন।

পাঠ-১০.২ পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন

Environmental Degradation and Climate change

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশগত অবক্ষয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানুষ পরিবেশ মিথষ্ক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশগত অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত শিল্পবিপ্লবের সূচনার মাধ্যমে যখন আধুনিক জীবনের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সূচনা। এটি মানুষের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, তথা আর্থসামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ফসল। পরিবেশ দূষণের কারণে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্যের হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশগত অবক্ষয় হয়। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশগত বিন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতিসাধন এবং পরিবেশগত প্রক্রিয়ার অবলুপ্তিকে পরিবেশ অবক্ষয় বলে। এছাড়া পরিবেশের সামাজিক এবং পরিবেশগত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মিটানোর ধারণক্ষমতা হ্রাসকেও পরিবেশগত অবক্ষয় বলে। নিম্নে পরিবেশগত অবক্ষয়ের কতিপয় সংজ্ঞা প্রদান করা হলো-

Derrick Tensen তাঁর The Problem of Civilization গ্রন্থে বলেন, ''The Global industrial economy is the engine for massive environmental degradation and massive human and non-human improvement''. অর্থাৎ বৈশ্বিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিকে পরিবেশগত অবক্ষয় এবং মানুষ ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হয়।

উইকিপিডিয়া (Wikipedia) অনুযায়ী, ''Environmental Degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources, such as air, water and soil; the destruction of ecosystems and the extinction of wildlife''. অর্থাৎ "পরিবেশগত অবক্ষয় হচ্ছে পরিবেশগত সম্পদসমূহের (বায়ু, পানি, মাটি) অবনতির মাধ্যমে পরিবেশের অবনতি, প্রতিবেশের ক্ষতি এবং বৃহৎ প্রতিবেশের প্রজাতির বিলুপ্তি।"

আন্তর্জাতিক সংস্থার কৌশল (United Nations International Strategy) অনুযায়ী, "Environmental degradation refers the reduction of the Capacity of the environment to meet social and ecological objectives and needs''. অর্থাৎ "পরিবেশগত অবক্ষয় হচ্ছে সামাজিক এবং পরিবেশগত উদ্দেশ্য ও চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশের ক্ষমতা হ্রাস।

পরিবেশ অবক্ষয়কে Environmental Impact এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। Environmental Impact এর সূত্রটি হলো-

সূত্রটি হলো-

$$I = PAT^1$$

এখানে,

P = জনসংখ্যার আকার (Population Size)
A = মাথাপিছু সম্পদের ব্যবহার (Per Capita Consumption)
T = প্রযুক্তি (Technology)
I = পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Impact)

অর্থাৎ পরিবেশগত প্রভাব হলো- জনসংখ্যার আকার, মাথাপিছু সম্পদের ব্যবহার এবং প্রযুক্তির গুণফল

পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ

Causes of Environmental Degradation

পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি অব্যাহত হতে থাকলে পরিবেশ অবক্ষয় হয়। দূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয় এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যদিও অনেকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেন। দূষণ স্বল্প এলাকায় বা স্থানীয় পরিসীমায় হতে পারে কিন্তু পরিবেশ অবক্ষয় স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্বজনীন হতে পারে। পরিবেশ অবক্ষয় দীর্ঘ সময়ে (শতাব্দী) হয়ে থাকে অপরদিকে পরিবেশ দূষণ স্বল্প সময়ে হতে পারে। যেমন- বিশ্ব উষ্ণায়ন হলো পরিবেশ অবক্ষয় এবং বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ হলো পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণসমূহকে ছাতা (Umbrella Concept) হিসেবে দেখিয়েছেন। চিত্র-১০.২ লক্ষ করুন।

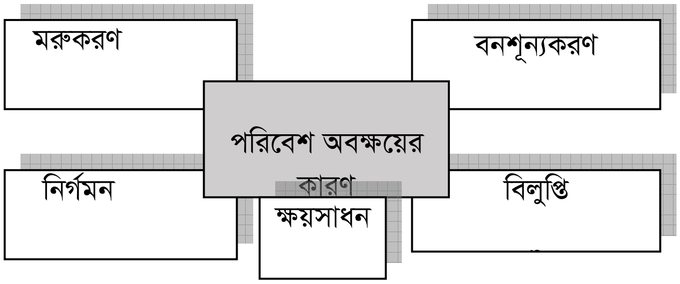

চিত্র-১০.২ পরিবেশ অবক্ষয়ের আম্রেলা (Umbrella) ধারণা[1]

পরিবেশগত অবক্ষয় প্রধানত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশক্ষয়ের কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূমির অবনমন ও উত্থান, চ্যুতি, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, বায়ুমন্ডলীয় ঝড়, দাবানল, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, অত্যধিক তুষারপাত, ভূ-তাত্ত্বিক ক্ষয়ীভবন, ভূমিধস, হিমানী সম্প্রপাত বন্যা প্রভৃতি। প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ প্রতিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং পরিবেশের অবক্ষয় তৈরি করে। মানবসৃষ্ট কারণসমূহের প্রধান কারণ হলো দূষণ। যেমন-বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, শব্দদূষণ ও ভূমি দূষণ প্রভৃতি। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে, বৃষ্টিহীনতা, লবণাক্ততা প্রভৃতি কারণে ভূমির স্বাভাবিক গুণাগুণ ও আদ্রতা নষ্ট হয়ে পরিবেশগত অবক্ষয় হয়। আধুনিকায়নের কারণে যানবাহনের কালো ধোঁয়া, শিল্প বর্জ্য, কৃষিবর্জ্য, পানি দূষণ প্রভৃতি কারণে পরিবেশ অবক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

Climate Change

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিনিয়ত আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু যখন আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তখন তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আইএফআরসি এর বৈশ্বিক দুর্যোগ রিপোর্ট, ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বের ১৭৩টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। যেমন-

১। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২। আকস্মিক বন্যা ও ভারি বৃষ্টিপাত দেখা যাচ্ছে।
৩। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে খরা দেখা যাচ্ছে।
৪। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[1] Khan, D., Noman, A., & Haider, Z. (2016). *Sociology of Environment* (2nd ed.). Grantha Kutir.

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অনুভূত হতো। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠেছে। ২০১৮ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১° সেন্ট্রিগ্রেড থেকে ১.৫° সেন্ট্রেগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করেছে। । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, দেরিতে বর্ষাকাল, স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ভারি বর্ষণ, লবনাক্ততা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে লবণাক্ততা বর্ষা মৌসুমে ১০ শতাংশ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে তা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয় । ইউএসবি এবং আইপিএস রিপোর্ট, ২০২০ অনুযায়ী লবণাক্ততা বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে। যেমন- ২০০৯ সালে যেখানে ১০৫.৬ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লবণাক্ততা ছিল তা বেড়ে ২০১৯ সালে ১০৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর হয়। লবণাক্ততার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশের কৃষিবৈচিত্র্য বদলে যাচ্ছে (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০২০)। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার দরুন উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙ্গন এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে গেছে। ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে। ইউএনডিপি ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালে চরচঙ্গা স্টেশন হাতিয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ৫.৭৩ মিলিমিটার এবং একই সময়ে হিরণ পয়েন্টে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ৩.৩৮ মিলিমিটার।

পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

Management of Environmental Degradation and Climate Change

পরিবেশের সাথে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ) সম্পর্ক নিবিড় এবং নিরবিচ্ছিন্ন। তাই পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাদি ভূমির সংকোচন, অধিক পরিমাণে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, কীটনাশক এর ব্যবহার, বনভূমি হ্রাস, অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা স্থাপন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে এবং পরিবেশগত অবক্ষয় বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়ছে। যেমন- ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধনের ফলে তৈরি হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। পরিবেশগত অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো বা মিটিগেশনের জন্য সর্বপ্রথম জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণের কারণ ও দূষণ নির্ণয় করে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে, দেশ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম (পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও ,টেলিভিশন) ও ডিজিটাল সোশাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশগত বিভিন্ন নীতির প্রায়োগিক দিক নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ দূষণের কবল থেকে বাঁচার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বনায়ন। জাতীয় বন-নীতি অনুসরণ করে অধিক হারে বনায়ন করতে হবে। বায়ুকে দূষিত করার পূর্বেই দূষিত বায়ু যেন নিরপেক্ষ হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। দূষিত পদার্থের পরিমাণ অনুযায়ী বায়ুতে রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে ছিটিয়ে দিলে দূষিত পদার্থকে নিরপেক্ষ করা যায়। জাপানের এসিড বৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করেছে। মটরযানের ধোঁয়া থেকে দূষণ রোধ করার জন্য সিসামুক্ত পেট্রোল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা যায়। এতে বায়ু দূষণ রোধ করা যাবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সুনামি, সিডর, নার্গিস, আইলাসহ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, পাহাড় ধ্বস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে গেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য প্রধান দুইটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। যথা-

১। মিটিগেশন **(Mitigation)**

২। অভিযোজন কৌশল **(Adaptation Strategy)**

১। **মিটিগেশন** (Mitigation)**:** মিটিগেশন হলো জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাইস গ্যাসসমূহের (CO_2, CH_4, CFC) বৃদ্ধি যা বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা ধরে রেখে গ্রিন হাউসের ন্যায় করার দরুন বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে চিত্র- লক্ষ করুন। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমানোর জন্য কয়লা, তেল,

প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাণুজ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বনায়ন করতে উৎসাহিত করতে হবে। বন নিধনহ্রাস করতে হবে।

২। **অভিযোজন (Abaptation):** পরিবর্তিত জলবায়ুতে বেঁচে থাকার জন্য গৃহীত সকল ধরনের কর্মকাণ্ড হলো অভিযোজন বা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো।

অভিযোজন কৌশল **(Adaptation Strategy):**

এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত অভিযোজন কৌশলসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

- সাইক্লোন, ঝড়-জলোচ্ছাস, টর্নেডোর মাত্রা রোধকল্পে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বনায়ন করতে হবে। যেমন: উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা যেতে পারে। জোয়ারের ঠিক বাইরের এলাকায় বিভিন্ন স্তরের (উচ্চতার) বন সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাতাসের বেগ কমাতে স্বল্প দূরত্বে গাছ লাগানো যেতে পারে ও বাঁশ জাতীয় বন সৃষ্টি করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পরিবর্তে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- জলাবদ্ধতা ও বন্যা রোধে উঁচু স্থানে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী গৃহনির্মাণ করতে হবে।
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধকল্পে লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে লবণ সহিষ্ণু ফসলের জাত নির্বাচন করতে হবে।
- গৃহ ও কৃষি কাজে মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পুকুর, ডোবা, খাল ও নদী খনন / পুনর্খনন করতে হবে, গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে,বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- নদীর উপকূল ক্ষয়হ্রাস করতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলগ্রহণ এলাকা (Water Shade) ব্যবস্থাপনা, নদী তীরে পাম জাতীয় গাছ ও কাশ ভার্টিভার জাতীয় তৃণ রোপণ করা যেতে পারে।
- মাছের আবাস পরিবর্তন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । ডিমপাড়া মৌসুমে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খরা রোধে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি জোরদারের মাধ্যমে প্রচুর বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিপন্ন কৃষিখাতে অভিযোজন কৌশল হিসেবে প্রতিকূল পরিবেশে উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং খরা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ ও টেকসই উৎপাদন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রতিবেশভিত্তিক (Eco-system based) সংরক্ষণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ সংরক্ষণ এবং ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সংকটাপন্ন প্রজাতি সনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- লবণাক্ত ও আর্সেনিক দূষণ এলাকার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির মাত্রানুযায়ী ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে।
- অবকাঠামো কৌশল হিসেবে ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম আবাসন গড়ে তুলতে হবে, মাছ ধরার নৌকার কাঠামো আধুনিকায়ন করতে হবে এবং স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপকূলীয় জনপদে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমাতে অভিযোজন কৌশল হিসেবে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, হাঁস পালন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

মানুষ পরিবেশ মিথস্ক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিবেশগত অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের সূচনার মাধ্যমে যখন আধুনিক জীবনের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই পরিবেশগত অবক্ষয়ের সূচনা। এটি মানুষের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, তথা আর্থসামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের ফসল। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশগত বিন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতিসাধন এবং পরিবেশগত প্রক্রিয়ার অবলুপ্তিকে পরিবেশগত অবক্ষয় বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিনিয়ত আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু যখন আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তখন তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আইএফআরসি এর বৈশ্বিক দুর্যোগ রিপোর্ট, ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বের ১৭৩টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। ২০১৮ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১$^\circ$ সেন্ট্রিগ্রেড থেকে ১.৫$^\circ$ সেন্ট্রেগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, দেরিতে বর্ষাকাল, স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ভারি বর্ষণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার দরুন উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙ্গন এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে গেছে। ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তিও দূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয় এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দূষণ স্বল্প এলাকায় বা স্থানীয় পরিসীমায় হতে পারে কিন্তু পরিবেশ অবক্ষয় স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্বজনীন হতে পারে। পরিবেশ অবক্ষয় দীর্ঘ সময়ে (শতাব্দী) হয়ে থাকে অপরদিকে পরিবেশ দূষণ স্বল্প সময়ে হতে পারে। যেমন- বিশ্ব উষ্ণায়ন হলো পরিবেশ অবক্ষয় এবং বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ হলো পরিবেশ দূষণ। বনশূন্যকরণ, মরুকরণ, নির্বাপণ,ক্ষয়সাধনও নির্গমণ প্রভৃতি কারণে পরিবেশ অবক্ষয় বাড়ছে। পরিবেশগত অবক্ষয় প্রধানত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশঅবক্ষয়ের কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূমির অবনমন ও উত্থান, চ্যুতি, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, বায়ুমণ্ডলীয় ঝড়, দাবানল, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, অত্যধিক তুষারপাত, ভূতাত্ত্বিক ক্ষয়ীভবন, ভূমিধস, হিমানী সম্প্রপাত বন্যা প্রভৃতি । মানবসৃষ্ট কারণসমূহের প্রধান কারণ হলো দূষণ। বায়ূদূষণ, পানি দূষণ, শব্দদূষণ ও ভূমি দূষণ প্রভৃতি পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। এছাড়াও পরিবেশগত অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণের কারণ, দূষণ নির্ণয় করে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হবে।

পাঠ-১০.৩ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি
Global Warming

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শীতপ্রধান দেশে গ্রিন হাউসের (কাঁচ নির্মিত একটি ঘর) মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয়। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ শীতপ্রধান দেশের গ্রিন হাউস ঘরের ন্যায় সূর্য থেকে আগত রশ্মি তাপ বিকিরণে বাঁধা সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। গ্রিন হাউস গ্যাস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের এইরূপ তাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট (Greenhouse effect) বলে। গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম সোভানটে আরহেনিয়াস প্রথম ব্যবহার করেন। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ হলো-কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC)। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হিসেবে নিম্নে গ্রিন হাউস গ্যাস ও গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ
Green House Gases

১। **কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO2):** কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, সামান্য গন্ধযুক্ত কার্বন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত একটি গ্যাস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ০.০৩ শতাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড। জীবের প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পচন, মোটরযান ও শিল্প কারখানার জ্বালানি (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল) পোড়ানো থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়। বর্তমানে তরল ও কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড রেফ্রিজারেন্ট হিসেবে আইসক্রিম, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। সবুজ উদ্ভিদ এর খাদ্য প্রস্তুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করলেও বন উজাড় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার, মোটরযানের সংখ্যা প্রভৃতি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে এবং বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে।

২। **মিথেন (CH4):** প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। এছাড়াও জলাভূমিতে পানির নিচে পানা পচনের মাধ্যমে, ধানের বর্জ্য অবশিষ্টাংশের পচন থেকে মিথেন পাওয়া যায়। তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইডের চাইতে ২০ গুণ বেশি তাপ ধারণ করে।

৩। **ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC):** সিএফসি সাধারণত বিষমুক্ত,নিষ্ক্রিয় এবং ফ্লোরিন ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। সিএফসি হিমায়নে (ফ্রিজ, এসি) ও স্প্রে-ক্যানে (অ্যারেসোল), মাইক্রো ইলেকট্রিক সার্কিট ও প্লাস্টিক ফোমে ব্যবহৃত হয়।

৪। **নাইট্রাস অক্সাইড** (N_2O): অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ তৈরি করে। এটিও বর্ণহীন, সামান্য মিষ্টিগন্ধযুক্ত। এই গ্যাসের উৎসসমূহ হলো মোটরযান, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার, কারখানা।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া

Green House Response

বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধি বৈশ্বিক পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পরিবেশের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাকে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বলে। নিম্নে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় অধিক প্রভাবিত হওয়া খাতসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১। **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা (Sea-Level):** গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসারণের কারণে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলশ্রুতিতে মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে । সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১.৫ মিটারের অধিক হলে নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিউল, বেইজিং এর মতো উপকূলীয় শহর, দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ যেমন মালদ্বীপ, টোকিও শহরসমূহ সহ উপকূলবর্তী অনেক এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।

২। **আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন (Weather and Climate Change):** বৈশ্বিক পরিবেশের মোট তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের তাপমণ্ডল ১০০-১৫০ কিলোমিটার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরে যাবে। এই কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহের (বৃষ্টিপাত, আদ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত) পরিবর্তনের কারণে মরুকরণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ায় বর্ষার প্রকোপ বাড়তে পারে। অপরদিকে শীতপ্রধান দেশ যেমন কানাডা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ এতো বেশি থাকবে না।

৩। **কৃষিশস্যের ক্ষতি (Damage of Agricultural Grains):** কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শস্যজাত কৃষিপণ্য যেমন ধান ও সয়াবিন জাতীয় শস্যের উৎপাদন কমে যাবে।

৪। **স্থলজ ও জলজ প্রাণি সম্পদ (Land and Aquatic Animal Resources):** ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে সহজে প্রবেশ করে। এতে স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশ সংকটাপূর্ণ হয়। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এন্টার্কটিকার ফাইটোপ্লাংকটন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে করে, ফাইটোপ্লাংকটনের ওপর নির্ভরশীল ফুডচেইন হুমকির সম্মুক্ষীণ হবে।

৫। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster):** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়সমূহ (আইলা, আম্পান, সিডর) বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল।

৬। **জীববৈচিত্র্য (Biodiversity):** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবী থেকে বহুপ্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এমন কী অনেক প্রজাতি বিশ্বব্যাপী হুমকিস্বরূপ।

সারসংক্ষেপ:

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ সূর্য থেকে আগত রশ্মি তাপ বিকিরণে বাঁধা সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। গ্রিন হাউস গ্যাস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের এইরূপ তাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট বলে। গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম সোভানটে আরহেনিয়াস প্রথম ব্যবহার করেন। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ হলো-কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধি বৈশ্বিক পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পরিবেশের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাকে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বলে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবী থেকে বহুপ্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এমন কী অনেক প্রজাতি বিশ্বব্যাপী হুমকিস্বরূপ।

পাঠ-১০.৪ ওজোন স্তরের ক্ষয়
Depletion of Ozone Layer

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ওজোন স্তরের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ওজোন স্তরের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ওজোন স্তর ক্ষয়রোধের ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন
- ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামক স্তরে ওজোন নামক গ্যাসের একটি পাতলা স্তর রয়েছে যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর অতিবেগুণি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। এটি ওজোন স্তর নামে পরিচিত। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওজোন স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওজোন স্তরের সৃষ্টি
Formation of Ozone Layer

অক্সিজেন অণু (O_2) তা ফোটন কণার দ্বারা দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে বিয়োজিত হয়। অর্থাৎ

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV ফোটন}} 2O$$

এই বিক্রিয়াটিকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া (Photochemical Reaction) বা আলোক বিয়োজন বলে। আলোক বিয়োজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন পরমাণুর সাথে অবিয়োজিত দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণুর বিক্রিয়ায় ওজোন (O_3) উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ার সাথে তাপ উৎপন্ন হয় বলে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে তাপমাত্রা অনেক বেশি। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। নিম্ন ও মধ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (১৫-৩৫ কি.মি. এর মধ্যে) ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক।

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV ফোটণ}} 2O$$

$$2O_2 + 2O \longrightarrow 2O_3 + \text{তাপ}$$

ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ
Causes of Depletion of Ozone Layer

বিভিন্ন কারণে ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। যথা-

- গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড, সালফার হেক্সা ক্লোরাইড) সমূহ ওজোন স্তরকে ক্ষতি করে কিন্তু সিএফসি গ্যাস প্রত্যক্ষভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের CFC গ্যাসের নাম উল্লেখ করা হলো। CFC এর মধ্যে CFC_{12} এবং CFC_{13} সর্বাধিক ক্ষতিকর। CFC_{12} এবং CFC_{13} এর কার্বন যৌগগুলো জায়মান দশায় ক্লোরিন উৎপাদন করে। উৎপন্ন ক্লোরিন ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোনের অণু ধ্বংস করে। এক লক্ষ ওজোনের অণু ধ্বংসের জন্য একটি ক্লোরিনের অণুই যথেষ্ট।

$$Cl + O_3 \longrightarrow Cl_2O + O_2$$

$$Cl_2O \longrightarrow Cl + O$$

- পারমানবিক পরীক্ষার জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণে ওজোন স্তরের ক্ষতি হয়। বিমান চলাচলের জন্য ওজোন স্তরের ক্ষতি হচ্ছে।
- নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার সৌরশক্তির প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইড তৈরি করে। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের অণু অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অণু ভেঙে রেডিকেলে পরিণত হয় এবং ওজোন স্তরকে ক্ষতি করে। এছাড়াও জৈব প্রাণীর দহনের ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ নাইট্রাস অক্সাইড তৈরি হয়।
- মিথেন গ্যাস ওজোন স্তরের ক্ষতি করে।

টেবিল্ ১০.১ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম

ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন
CFC-11	ট্রাই কেরো ফ্লুরো সিথেন $CFCl_3$
CFC-12	ডাই ক্লোরোফ্লুরোমিথেন CF_2Cl_2
CFC-113	ট্রাই ক্লোরো ফ্লুরোইথেন $C_2F_3Cl_3$
CFC-114	ডাই ক্লোরো টেট্টা ফ্লুরোইথেন $C_2F_4Cl_2$
মিথাইল ক্লোরোফর্ম	ট্রাই ক্লোরো ইথেন $C_2H_3Cl_3$
HCFC-132	ডাই ক্লোরো ডাই ফ্লুরোইথেন $C_2H_2F_2Cl_2$
HCFC-141	ডাই ক্লোরো ডাই ফ্লুরো ইথেন $C_2H_3FCl_2$
HCFC-223	টেট্রাক্লোরো ট্রাই ফ্লুরো প্রোপেন $C_3HF_3Cl_4$
HCFC-244	ক্লোরোটেট্রা ফ্লরো প্রোপেন $C_3H_3F_4Cl$

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪

ওজোন স্তরের ক্ষতিকর প্রভাব

Destructive Effect of Depletion of Ozone Layer

ওজোন স্তরের ক্ষতির কারণে অতিবেগুণি রশ্মি (UV-A, UV-B) এর প্রভাবে, চামড়ার ভাঁজ পড়া, ত্বকের রং পরিবর্তন এমন কী ত্বকের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মির কারণে চোখের দৃষ্টিহীনতা, ছানি পড়া, মানসিক বিকৃতি প্রভৃতির প্রবণতা বাড়ছে। সর্বোপরি, আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এবং ওজোন স্তরের ক্ষতির (Ozone Layer Depletion) দরুন জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, প্রতিবেশগত পরিবর্তন হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে। তাই ওজোন স্তরের ক্ষয়রোধে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ওজোন স্তর ক্ষয়রোধের ব্যবস্থা

Prevention of Depletion of Ozone Layer

ওজোন স্তরের ক্ষয়রোধে সর্বপ্রথম গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে জৈবসারের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে এবং নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। বন নিধন রোধ করে বনভূমি সংরক্ষণ এবং বনভূমি বৃদ্ধি করতে হবে। ওজোন স্তরের ক্ষয়রোধ সারাবিশ্বের জন্য পরিবেশগত উদ্বিগ্নের বিষয়। ওজোন স্তর ক্ষয়রোধে আন্তর্জাতিক নীতি ও বিভিন্ন চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশেও ওজোন স্তর ক্ষয়রোধের জন্য নীতিমালা- ২০০৪ রয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামক স্তরে ওজোন নামক গ্যাসের একটি পাতলা স্তর রয়েছে যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে তাপমাত্রা অনেক বেশি। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। নিম্ন ও মধ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (১৫-৩৫ কি.মি. এর মধ্যে) ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ (কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড, সালফার হেক্সা ক্লোরাইড) সমূহ ওজোনস্তরকে ক্ষতি করে কিন্তু সিএফসি গ্যাস প্রত্যক্ষভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে। CFC গ্যাসসমূহের মধ্যে CFC_{12} এবং CFC_{13} সর্বাধিক ক্ষতিকর। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের অণু অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অণু ভেঙে রেডিকেলে পরিণত হয় ও ওজোন স্তরকে ক্ষতি করে। ওজোন স্তরের ক্ষতির কারণে অতিবেগুনি রশ্মির (UV-A, UV-B) প্রভাবে, চামড়ার ভাঁজ পড়া, ত্বকের রং পরিবর্তন এমন কী ত্বকের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মির কারণে চোখের দৃষ্টিহীনতা, ছানি পড়া, মানসিক বিকৃতি প্রভৃতির প্রবণতা বাড়ছে। সর্বোপরি, আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এবং ওজোন স্তরের ক্ষতির দরুন জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, প্রতিবেশগত পরিবর্তন হচ্ছে। ওজোন স্তরের ক্ষয়রোধ সারাবিশ্বের জন্য পরিবেশগত উদ্বিগ্নের বিষয়। ওজোন স্তরের ক্ষয়রোধে সর্বপ্রথম গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে জৈবসারের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে এবং নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। বন নিধন রোধ করে বনভূমি সংরক্ষণ এবং বনভূমি বৃদ্ধি করতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. বৈশ্বিক পরিবেশগত ইস্যুজসমূহ কী কী?

২. পরিবেশগত অবক্ষয় কাকে বলে?

৩. পরিবেশগত অবক্ষয়ের কী কী কারণ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৪. জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে?

৫. জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা আলোচনা করুন।

৬. পরিবেশগত অবক্ষয় ব্যবস্থপনা আলোচনা করুন।

৭. মিটিগেশন কী?

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজন কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

৯. গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট বলতে কী বোঝায়? গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ কী কী? বর্ণনা করুন।

১০. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

১১. ওজোনস্তর ধব্বংসের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

১২. ওজোনস্তরের ক্ষতিকর প্রভাব কী কী হতে পারে?